ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র

বিশ্বজিৎ সাহা

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েও শেষ হয় না। আসলে সব শেষেরই একটা শুরু থাকে। অনেকটা জীবনের মতন, ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মতন, ইতিহাসের মতন। কারণ যা ঘটে চলেছে তার সবটাই তো পরমুহূর্তেই ইতিহাস।

বছর তিনেক আগে অরিন্দম ঘোষ (বাপি)'দার ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ভদ্রলোকের, কোনো অজানা কারণে অনেক বিষয়েই অগাধ জ্ঞান। সেদিন আলোচনা হচ্ছিল হিন্দু মিথোলজি, মহাভারত, সমকালীন আরও কিছু সভ্যতা নিয়ে। আলোচনা ঠিক নয়, উনি বলছিলেন আর আমি বরাবরের মতন শ্রোতা। আজ গভীরে গিয়ে ভাবলে বুঝতে পারি সেদিন যেখানে সেই আলোচনা শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হয়েছে আমার এই উপন্যাস।

পাঠ্য হিসাবে শেষবার ইতিহাস পড়েছিলাম প্রায় কুড়ি বছর আগে। সোদপুর হাই স্কুলে ছিলেন আমার এক প্রিয় ইতিহাসের শিক্ষক। এবারেও নামটা এক, বাপিস্যার। গল্পের ছলে ইতিহাস পড়াতেন। সবাই বলত উনি ঠিক মতন পড়াতেই জানেন না। প্রায় কুড়ি বছর আগে তাঁর সেই ক্লাস যেখানে শেষ হয়েছিল আমার এই উপন্যাস সেখান থেকেই শুরু।

কয়েক বছর আগে একটা নন ফিকশন সিরিজ লিখছিলাম, 'মিশরের রহস্যময়ী রানিরা'। পড়াশোনা করতে গিয়ে প্রায় প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম এক মিশরীয় রানির। তাঁর রহস্যে ঘেরা জীবনের প্রতি অবসেসড হয়ে পড়েছিলাম। সেই রানী হাতশেপসুট-এর পাঁচ হাজার বছর আগের জীবন যেখানে শেষ হয়েছিল আমার এই উপন্যাসের শুরু সেখানেই।

মিথোলজি সম্পর্কিত কন্সপিরেসি থিয়োরি নিয়ে লেখার সুপ্ত ইচ্ছে অনেকদিনের। তবে সাহসটা সেদিন পেয়েছিলাম যেদিন স্ত্রী কান্তাকে প্লটগুলো শুনিয়েছিলাম। একই সঙ্গে প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতাকে জুড়ে দিয়েছিলাম সেই প্লটে। ফারাও, হায়ারোগ্লিফ, মহাভারত, পিরামিড, হিন্দু মিথোলজি— সব মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বিগত দুটো বছরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। বর্তমান পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার এক সুস্পষ্ট লড়াইও ফুটে উঠেছিল অধ্যায়গুলিতে। ইতিহাস এবং বর্তমানকে পাশাপাশি রেখে চলার এক প্রচেষ্টা ছিল সেখানে, ঠিক শেষ এবং শুরুর মতন।

ইতিহাস এবং বর্তমানকে কাটাছেঁড়া করে এই উপন্যাস লেখা শেষ হয়েছে। এখন অপেক্ষা ভবিষ্যতের, পাঠকের মতামতের, এক নতুন শুরুর যার কোনো শেষ নেই...

যাত্রা শুরু...
১৪৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, থিবস, প্রাচীন মিশর

গতকাল রাত থেকেই ক্রমাগত হেঁটে চলেছে লোকটা। অবসন্ন পা'দুটো যেন আর কিছুতেই চলতে চাইছে না তার। ক্ষতবিক্ষত শরীরটাও এবার আর প্রাণ ধরে রাখতে পারছে না যেন। পরনের সাদা ধুতির মতন পোশাকটা বালিতে মাখামাখি। খালি গায়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, তাজা রক্তে বালি আটকে শুকিয়ে গেছে সেখানে। মধ্যরাত্রি পার হয়ে এখন রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণ, ভোর বলা চলে না এই সময়কে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে চারদিক। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই বালি আর বালি, বিস্তীর্ণ মরুভূমি। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সেই মরুভূমির বালির ওপর পড়ে ছিটকে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। কী অসম্ভব ঠান্ডা এই মরুভূমির বুকে, খোলা আকাশের নিচে! চুল কামানো মাথাতেই সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা লাগছে তার। মুখের চামড়া যেন জায়গায় জায়গায় ফেটে যাচ্ছে। শরীরটা তো প্রায় অবশ, কিছুই যেন অনুভব করতে পারছে না। চলতে চলতে তার পা'দুটো ঢুকে যাচ্ছে সেই মরুভূমির বালির গভীরে। পা আটকে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে সে, পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। টলমলে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, নিজেকে বলছে আর কিছুটা মাত্র পথ। এই পথটুকু তাকে অতিক্রম করতেই হবে। পথের শেষে রয়েছে যে গন্তব্য সেখানে তার প্রেয়সী অপেক্ষায় করছে। তার প্রেয়সী ইতোমধ্যেই এই জীবন সম্পন্ন করেছে, এখন সে তার অপেক্ষা করছে মৃত্যুর পরের জীবনে একত্র হবার জন্য। তাই পথ যতই দুর্গম হোক, শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, তাকে পৌঁছাতেই হবে সেই গন্তব্যে, অপেক্ষারত প্রেয়সীর কাছে।

শক্তিশালী সেই শত্রুপক্ষ গতকালই তার লুকিয়ে থাকার ডেরার সন্ধান পেয়েছিল। নীলনদের এপারে বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে যে বিশাল পিরামিডটা তৈরি করা হয়েছিল, তার কোলের কাছেই একটা গোপন জায়গায় বেশ কিছুদিন ধরে লুকিয়ে ছিল লোকটা। শত্রুপক্ষ তার প্রেয়সীকে ইতোমধ্যেই খুন করেছে। খুঁজে পেলে তাকেও

ছাড়বে না। শুধুমাত্র খুন করেই তাদের শান্তি নেই। তারা পাগল কুকুরের মতন তার প্রেয়সীর মৃত শরীরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা চাইছে এই পৃথিবী থেকে তার প্রেয়সীর যাবতীয় অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে। কিন্তু সে তা কিছুতেই হতে দিতে পারে না। একদিন ভবিষ্যৎকে সমস্ত সত্য জানতেই হবে। ভবিষ্যতের কাছে তার মহান প্রেয়সীর যাবতীয় সত্য পৌঁছে দেবার সেই দায় যেন লোকটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। গতকাল শত্রুপক্ষের লোকেরা তার ডেরায় আসার আগেই সে যাবতীয় সহায়-সম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে। নীলনদের ধারের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়েছিল এই মুহূর্তে তার একমাত্র বন্ধু সেই পুরোহিতের কথা। সে আবার তাদের পরিবারের একজনও বটে। নীলনদের ধারের বিশাল সূর্যমন্দিরটার প্রধান পুরোহিত তার সেই বন্ধু। খুব সন্তর্পণে রাতের অন্ধকারে লোকটা গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার পুরোহিত বন্ধুর আশ্রয়ে, নীলনদের ধারে বিশাল পাথরের চাঁই কেটে বানানো সেই মন্দিরে। বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিল তার জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। মন্দিরে গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে বন্ধুর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল। পুরোহিত বন্ধু কথা দিয়েছিল নিজের প্রাণের বিনিময়েও শত্রুর হাত থেকে সে ওই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করবে। পুরোহিত বন্ধুর কাছে কাজ সেরে লোকটা আবার বেরিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে।

ভোরের দিকে লোকটা ধরা পড়ে গেল শত্রুপক্ষের সেনাদের হাতে। তখন সে নীলনদের ওপারের মরুভূমির উদ্দেশে চলেছিল। রাতে সাঁতরে পার হয়েছিল নীলনদের বিশাল জলরাশি। নদীর উলটো তীরে যখন সে সেনাদের হাতে ধরা পড়ল তখন বুঝতে পারল তারা ওকে মেরে ফেলতেই বেশি আগ্রহী। প্রাণসংশয়ের মুহূর্তে যে-কোনো মানুষেরই শারীরিক শক্তি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তারও তাই হল। একাই লড়ল পাঁচজন সৈনিকের সঙ্গে। তবে তাদের শান দেওয়া পাথরের আর তামার অস্ত্রে তার সারাটা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। ঝাপটাঝাপটির পর কোনোরকমে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল সে। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল পার্শ্ববর্তী বিশাল পাথরের খনির অন্ধকারে।

সারা শরীর দিয়ে ক্রমাগত রক্তক্ষরণের ফলে তার শরীরের যাবতীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। পথশ্রমে কখন যে অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি সে। সন্ধের পর হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে এল। হকচকিয়ে উঠে সবার আগে নিজের পোটলাটা খুঁজে দেখল জিনিসটা আছে কি না। যে অমূল্য জিনিসের একটি অংশ সে রেখে এসেছিল তার পুরোহিত বন্ধুর কাছে আর বাকি অংশটা রেখেছিল নিজের কাছে। সেনাদের সঙ্গে লড়াই

করার সময় সে এটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। জিনিসটা হাতে পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। সারা শরীরে ক্ষতের যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা ছাপিয়েও মনে পড়ল তার প্রেয়সীর কথা। তার কাছে পৌঁছাতে হবে তাকে, সে যে মৃত্যুর পরের জীবনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে! আবার শুরু করেছিল পথ চলা।

চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে থামল লোকটা। কিছুটা দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নিজের মনেই হাসল। মনে মনে বলল, অবশেষে আমি তোমার কাছে পৌঁছে গেছি, আমার রানি! সারাটা জীবন ধরে আমরা যে অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছি তার অবসান হবে এবার, মৃত্যুর পরের জীবনে।

কিছুটা দূরত্বে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট পিরামিড। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়েও বালির ওপর দিয়ে দৌড় দিল লোকটা, পাছে কেউ তাকে ধরে ফেলে। এত কাছে এসেও সে যদি তার প্রেয়সীর কাছে পৌঁছাতে না পারে, যদি শেষরক্ষা না হয়! শরীরের সমস্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে তাই সেই মরণপণ দৌড়। পিরামিডের কাছে এসে কোনো এক গোপন রাস্তা দিয়ে তার ভেতরে ঢুকল সে। এমনিতে বাইরে থেকে দেখলে পিরামিডের ভেতরে ঢোকার কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ভেতরে ঢোকার রাস্তা একটা আছে।

ভেতরে ঢুকে একটা মশাল জ্বালাল লোকটা। সেটা হাতে নিয়েই তরতর করে গোপন রাস্তা ধরে পিরামিডের নিচের দিকে নামতে লাগল। একদম নিচে এসে একটা গুপ্তকক্ষের ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর মৃতপ্রায় শরীরটা নিয়েই কক্ষের ভেতরে রাখা কতগুলি পাথরের ব্লক দিয়ে কক্ষের মুখটা বন্ধ করে দিল, চিরদিনের মতন। মশালটা নিভিয়ে দিয়ে শরীরটা ছুড়ে দিল সূক্ষ্ম সাদা রঙের কাপড়ে ঢাকা একটা মৃতদেহের ওপর। নিজের থলে থেকে একটা কিছু বের করে মৃতের শরীরে জড়ানো সাদা কাপড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। তারপর কিছুটা দূরে সরে গিয়ে মৃত শরীরটার উদ্দেশে বলল, তুমি শান্তিতে ঘুমাও, আমার রানি। আমি এইখানে বসে পাহারা দেব, আজীবন। তারপর মৃত্যুর পরে আবার এক হয়ে যাব আমরা দু'জনে। তোমার শত্রুরা আর কখনোই খুঁজে পাবে না তোমাকে। তবে তোমাকে চিরদিনের জন্যে হারিয়েও যেতে দেব না আমি। ভবিষ্যৎ পৃথিবী এক না একদিন ঠিক জানতে পারবে তোমার ইতিহাস। তারা চিনতে পারবে তোমাকে। সেদিন তোমার সঙ্গে হয়তো স্বীকৃতি পাব আমি আর আমাদের ভালোবাসাও।

সাড়ে তিন হাজার বছর পর...
ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড

গত দু'দিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আজ সকাল থেকে আবার হালকা বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ব্রিস্টলের আকাশ থেকে। মিহি বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আকাশ থেকে নেমে আসা মাত্র ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে। তুষারশুভ্র কোনো পাখির এক একটা পালক যেন ব্রিস্টলের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, গায়ে শীতল বাতাস মেখে। দিনটা আজ রবিবার, ছুটির দিন। তার ওপর সামনেই ভালোবাসার দিন, ভ্যালেন্টাইনস ডে। ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির বেশিরভাগ আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছে গতকালই। অবশ্য বিদেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের কপালে সেই সুখ নেই। আগামী দু-তিনদিন ইউনিভার্সিটি প্রায় ফাঁকাই থাকবে। এত বড়ো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা কেমন যেন খালি খালি। অন্যান্য দিনে সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আজ চারদিকটা খুব শান্ত। ইউনিভার্সিটির বাগানের মালিরা বিভিন্ন জায়গায় সবুজ ঘাসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জল দেওয়ার মেশিন চালিয়ে দিয়েছে। ফোয়ারার মতন জল বের হচ্ছে সেগুলো থেকে। ক্যাম্পাসের ভেতরের পাইন আর ইউক্যালিপটাসের গাছগুলো সাদা পালকের মতন বৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করছে। ইউনিভার্সিটির আবাসনে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা প্রায় কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও। গথিক স্টাইলে তৈরি বিশাল বিল্ডিংগুলো নিঃশব্দে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান বিল্ডিংটার মাথায় লাগানো বিশাল আকারের গোল ঘড়িটা আটবার বেজে উঠে সময় নির্দেশ করল, এখন সকাল আটটা বাজে।

***

দু'দিন ধরেই দেহলীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণেই বোধহয় জ্বর এসেছে তার। প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে। এদিকে দেহলী আবার ওষুধ খেতে একদমই পছন্দ করে না। গতকাল তার প্রফেসর ড. ঘোষালের জোরাজুরিতে ওষুধ খেতে বাধ্য হয়েছিল সে। তবে

আজ আর সে কোনো ওষুধ খাবে না বলেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে জানে এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে তার শরীর। দেশে থাকতেও যখনই আবহাওয়ার পরিবর্তন হত, তখন তার এরকম শরীর খারাপ করত, আবার এমনিই ঠিক হয়ে যেত। ইউনিভার্সিটির হস্টেলে যে ঘরটাতে সে আর একটি বাংলাদেশি মেয়ে একসঙ্গে থাকে, সেখানেই একটা মোটা ব্ল্যাংকেট মুড়ে এখনও শুয়ে আছে দেহলী। আজ মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে তার, বাবার কথা যদিও বিশেষ মনে পড়ে না। একটা মানসিক দূরত্ব আছে দু'জনের মধ্যে।

দেহলী ইংল্যান্ডে এসেছে প্রায় সাত মাস হয়ে গেছে। সে অ্যানথ্রোপোলজির ছাত্রী, প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে রিসার্চ করতেই ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে এসেছে সে। স্কলারশিপের টাকায় বেশ টানাটানি করেই তার চলে এখানে। অবশ্য খুব ছোটোবেলা থেকেই সে মিতব্যয়ী, বাজে খরচ একদমই করে না, ঠিক তার বাবার মতন। দেহলী কিন্তু কোনোদিক থেকেই সুন্দরী নয়। তার গায়ের রং ফর্সা হলেও সে স্বাভাবিক ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা। মুখমণ্ডলে চোখদুটো টানা টানা হলেও বাকি কিছু তেমন আকর্ষণীয় নয়। তাই সে ছোটোবেলা থেকেই বুঝতে পেরেছিল অন্যান্য অনেক বান্ধবীর মতন সৌন্দর্য তার ইউ.এস.পি হবে না। তাকে নিজের ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে। নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই দিয়েই সে অনেক সমস্যা অতিক্রম করতে পারবে। সে করেছেও তাই। সত্যিই তার রয়েছে একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যা বেশিরভাগ সুন্দরীদেরই থাকে না।

এখানে আসার পরই দেহলী জানতে পেরেছে যে প্রফেসরের অধীনে তাকে রিসার্চ করতে হবে তিনিও একজন ভারতীয়, এমনকি তার মতন তিনিও বাঙালি। কিন্তু প্রথমবার যখন পরিচয় হল প্রফেসরের সঙ্গে, তার মনে হয়ে ছিল এর থেকে কোনো বিদেশি হলেই বোধহয় ভালো হত। কম্বলটাকে নিজের শরীরে আঁটোসাঁটো করে জড়িয়ে নিজের মনেই হেসে ফেলল দেহলী। হঠাৎ মনে পড়ল সেই দিনটার কথা। প্রথম দর্শনেই তার প্রফেসর ড. অমিতাভ ঘোষাল বুঝিয়ে দিলেন তিনি সহজ মানুষ নন। প্রথম কথাই বললেন কাটা কাটা ইংরেজিতে। জানালেন, আমি বাঙালি হলেও আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করবেন না। কাজের কথা ছাড়া আজেবাজে কথা বলাও আমার বিশেষ পছন্দ নয়। দেহলীকে একটাও কথা বলতে না দিয়ে তিনি আবার বলেছিলেন, এখান থেকে সোজা লাইব্রেরিতে চলে যান। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তবে পরের কিছুদিনে দেহলী ড. ঘোষালের থেকে অনেক সাহায্যই পেয়েছিল। তখন তার মনে হত প্রথম

দর্শনে পরিচিত হওয়া মানুষটার বাইরেটা একরকম আর ভেতরটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাইরে রূঢ় ব্যবহারের মানুষটার একটা সুন্দর মনও আছে, কিছুটা যেন ঝুনো নারকেলের মতন। আস্তে আস্তে তাদের সম্পর্কটা যখন সহজ হয়ে উঠছিল ঠিক তখনই ঘটল অঘটন।

দেহলীর ঘরের বাংলাদেশি মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। এখন সে ব্রেকফাস্ট করতে ক্যাফেটেরিয়াতে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মেয়েটি দেহলীকে ডেকে তুলে দিল। দেহলী তাকে জানাল, আমি এখন খেতে যাব না। শরীরটা ঠিক নেই। সে আবার শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ড. ঘোষাল সোজা ঢুকে এলেন তার ঘরে। তার হাতে একটা প্লাস্টিকের ট্রে'তে স্যান্ডউইচ আর কফি। এসেই এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে দেহলীর বিছানায় বসে পড়লেন। তারপর তার কপালে হাত দিয়ে দেখে বললেন, জ্বর তো এখনও কমেনি দেখছি। এখন আগে উঠে ব্রেকফাস্ট করো। তারপর ওষুধ খাবে। বছর চল্লিশের প্রফেসর ড. অমিতাভ ঘোষালের হাতের স্পর্শে পঁচিশ বছরের দেহলীর শরীরে রোমাঞ্চ জাগে সেই অঘটনের পর থেকেই। দেহলী প্রফেসরের হাতটা নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। প্রফেসর তাকে জোর করে তুলে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। তারপর দেহলী তার ধনুকভাঙা পণ ভেঙে ওষুধ খেল। ঠিক সেইসময় প্রফেসরের মোবাইলটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল তার স্ত্রীর ছবিসহ নম্বর। তার একটি পুত্রসন্তানও আছে। তারা দেশেই থাকে। দেহলী আড়চোখে তাকাল প্রফেসরের দিকে। তিনি উঠে গেলেন। বলে গেলেন, সময়মতো লাঞ্চে চলে এসো। দেরি করবে না।

মনটা খুব খারাপ হল দেহলীর, প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপরেই। কিন্তু সে যে প্রফেসরকে ভালোবাসে, প্রফেসরও তাকে, সে-ব্যাপারে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। অথচ তাদের একসঙ্গে কোনো ভবিষ্যত সে দেখতে পায় না। প্রফেসর বলেন, জীবনের যতটুকু মুহূর্ত একসঙ্গে কাটানো যায় সেটাই বা কম কীসের! সম্পর্ক নাকি লম্বা হওয়ার চেয়ে গভীর হওয়া বেশি জরুরি।

তা'ও দেহলীর মনটা কিছুতেই মানতে চায় না। প্রফেসরকে মন থেকে সরিয়েও দিতে পারে না সে। মানুষটা একদম খাঁটি, খুব গুণীও বটে। আসলে দেহলীই তো প্রথম এগিয়েছিল তাঁর দিকে। প্রফেসর কিন্তু কিচ্ছু গোপন করেননি তার থেকে। হঠাৎ দেহলীর দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। কিছুতেই বাগ মানছে না তা। বিগত তিন-চার মাসের সমস্ত স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছে চোখের সামনে। লাইব্রেরির ফাঁকা ঘরে সেদিন

সে প্রথমবার ছুঁয়েছিল প্রফেসরকে। লম্বা, ছিপছিপে চেহারার গড়ন, গালের না-কামানো দাড়ি, গাঢ় কালো চোখের মণি, নীল টি-শার্ট, ভারী কণ্ঠস্বর সবই আকর্ষণ করেছিল দেহলীকে। তবে মানুষটার অমলিন সরলতাই সব থেকে বেশি করে টেনেছিল তাকে। সেদিন প্রথমবার চুমু খেয়েই দেহলী অনুভব করেছিল মানুষটার ভেতরে লুকিয়ে থাকা নৃশংস সততা।

হস্টেলের বিছানায় বসে বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল তার। শরীরটা যেন কিছুটা ভারমুক্ত লাগছে। হয়তো ওষুধের কারণেই। উঠে পড়ল দেহলী। নিজেকে বোঝাল, আর মাত্র পাঁচ মাস আছে তার হাতে, থিসিস জমা করতে হবে। স্কলারশিপ শেষ হয়ে যাবে তারপর। সামনে প্রচুর পড়াশোনা। এখন এসব ভাবলে চলবে না। প্রফেসর ঠিকই বলেন, মুহূর্তকে বাঁচো, প্রতিটা মুহূর্তই এক একটা জীবন।

কয়েকমাস পর...
জুন ২০০৯, কায়রো মিউজিয়াম, ইজিপ্ট

১৫ মেরেট বাসা, ইসলামিয়া রোডের ডান দিকের বিশাল মনুমেন্টাল গেটটার দিকে দেখলেই অনুমান করা যায় এর ভেতরে কত প্রাচীন গাথা লেখা থাকতে পারে। গেট পার করে একটু এগিয়ে গিয়েই গোলাকৃতি দোতলা বাড়িটা, যার বাইরের তুলনায় ভেতরের বিশালত্বই সারা পৃথিবীর মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। এ হল কায়রো মিউজিয়াম, যাকে 'দি মিউজিয়াম অফ ইজিপ্সিয়ান অ্যান্টিকুইটিস' নামে জানেন বিশেষজ্ঞরা। শুধুমাত্র গ্রাউন্ড ফ্লোরেই রয়েছে সত্তরটি সুবিশাল ঘর, যার প্রত্যেকটি ঠাসা রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনে। মমি, টুম্ব, সারকোফেগাস, প্যাপিরাস, বিভিন্ন ধরনের হায়ারোগ্লিফ— কী নেই সেখানে! প্রস্তরযুগের ঠিক পরেই শুরু হওয়া প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার প্রায় সাড়ে ছ'হাজার বছরের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস সঞ্চিত রয়েছে এই কায়রো মিউজিয়ামে। ওপরের তলাতে রয়েছে প্রাচীন মিশরের বিশেষ কিছু ফারাওদের নির্বাচিত সব নিদর্শন। সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার প্রাচীন মিশরীয় কালেকশন রয়েছে এই মিউজিয়ামে।

বিগত তিনটে দিন ধরে মিউজিয়ামের নিচের তলার কোণের দিকে একটি ঘরে দু'জন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তারা প্রায় সারাদিনই ওই ঘরটায় একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করে। সেই সকাল ন'টায় মিউজিয়াম খোলার সঙ্গে সঙ্গে এসে তারা ওই ঘরে ঢোকে। আর মিউজিয়াম বন্ধ হবার আগে সিকিউরিটি এসে যখন তাদের সূচনা দেয় তখন তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দুটো সুপ্রাচীন প্যাপিরাস এবং তাতে প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ হরফে লেখা কিছু তথ্য। এই ঘরটায় প্রধানত ফারাও তৃতীয় তুতমোসিস-এর সময়কালের বিভিন্ন নিদর্শন সাজিয়ে সুরক্ষিতভাবে রাখা রয়েছে। লোকদুটি সেই সমস্ত কিছুও ঘেঁটে ঘেঁটে দেখে মাঝেমধ্যে।

দু'জনের মধ্যে একজন ভারতীয়, নাম যাদুরাপ্পা। আর দ্বিতীয়জন ইংরেজ, তার নাম মিলস। এরা দু'জনেই ইজিপ্টোলজিস্ট, অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা নিয়ে পড়াশোনা এবং রিসার্চ করছে, তবে দু'জনের কেউই সেরকম বিখ্যাত নয়। দু'জনেই চল্লিশোর্ধ, তবে বেশ পেটাই চেহারা। দু'জনই বেশ লম্বা আর চওড়াও বটে। গায়ের রঙের ব্যাপারে অবশ্য তারা পূর্ব আর পশ্চিম, অর্থাৎ মিলস একজন প্রকৃত ইংরেজের মতনই ধবধবে ফর্সা আর যাদুরাপ্পার গায়ের রং প্রকৃত অর্থেই কুচকুচে কালো। মিলসের মাথায় সোনালি চুল বেশ কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে আর যাদুরাপ্পার মাথাটা প্রায় পুরোই টাক। বছর দুয়েক আগে লন্ডনে একটা প্রাচীন সভ্যতা সংক্রান্ত সেমিনারে দু'জনের পরিচয় হয়েছিল। তারপর থেকে তারা বন্ধুস্থানীয়।

টেবিলটার একদিকে দাঁড়িয়ে একটা প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাস হাতে নিয়ে যাদুরাপ্পা ইংরেজিতে মিলসকে বলল, এটা ভালো করে দেখো তো! এটায় লেখা হায়ারোগ্লিফ অক্ষরগুলোর প্যাটার্ন বেশ অন্যরকম লাগছে। এর আগেও আমি অনেক হায়ারোগ্লিফ পড়েছি। তবে এই প্যাপিরাসটায় লেখা বেশ কিছু শব্দ কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি না। যাদুরাপ্পার ইংরেজি উচ্চারণে সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

তার কথা শুনে মিলস বলল, সে তো তুমি তিন দিন ধরে একই কথা বলে যাচ্ছ। কিন্তু তুমি নিজেও জানো এই প্যাপিরাসের লেখাগুলো উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

যাদুরাপ্পা হাতের প্যাপিরাসটা টেবলের ওপর রেখে দিয়ে সেখানে রাখা অন্য একটি প্যাপিরাস তুলে নিয়ে আবার বলল, এটা তো আমিই পাঠোদ্ধার করলাম। বিগত একশোটি বছর ধরে কেউই তো এর গুরুত্ব বোঝেনি, এমনকি তুমিও না। তার গলায় কিছুটা শ্লেষ ধরা পড়ল।

মিলস এবার একটু হেসে বলল, আমি যদি তোমার মতন হায়ারোগ্লিফ বিশেষজ্ঞ হতাম তাহলে তো আর তোমার দরকারই হত না, বুঝলে যাদুরাপ্পা। এখন আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই প্যাপিরাসটা পাঠোদ্ধার করে ফেলতে হবে। ওদিকে ইংল্যান্ডে আমার সব কাজের বারোটা বেজে যাচ্ছে। আমাকে পরশুই ফিরতে হবে।

যাদুরাপ্পা ঘরের দেয়ালের ওপর হেলান দেওয়া অবস্থায় কাচের বাক্সে রাখা একটি মমির সামনে গিয়ে বলল, এই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া!

এতক্ষণ ঘরটার মধ্যে আর কেউ ছিল না। এখন একজন চিনা ভদ্রলোক এসে ঢুকল। যাদুরাপ্পা আর মিলস দু'জনেই তাকে দেখে টেবিলটার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। তখন তারা ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলো

ঘুরে দেখতে লাগল। একে অপরের সঙ্গে আর কোনো কথা বলল না, যেন চেনেই না দু'জন দু'জনকে। চাইনিজ লোকটা ঘরের মধ্যে নিজের মনে কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল। টেবিলটার ধারেকাছেই এলো না সে। আসলে এই ঘরটার ওপর বিশেষ কারোর নজর নেই। বেশিরভাগই এখানে দেখতে আসে ফারাও খুফু আর তুতেনখামেনের বিজ্ঞাপিত সরঞ্জামগুলিকে। তা ছাড়া আর এক আকর্ষণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুন্দরী ফারাও ক্লিওপেট্রা। ইতিহাস বলে তিনি নাকি নিজের সৌন্দর্য দিয়ে বশ করেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি জুলিয়াস সিজারকেও। তবে ক্লিওপেট্রার শাসনকালের পরই প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্য চলে গিয়েছিল রোমানদের অধীনে।

চাইনিজ লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ওরা দু'জনে আবার এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। এবার যাদুরাপ্পা বলল, যে প্যাপিরাসটা ইতোমধ্যেই পাঠোদ্ধার করেছি সেটাতেই তো একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

তার কথায় সম্মতি জানিয়ে মিলস বলল, হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে কেন জানি না আমার মনে হয় এটা পড়তে পারলে সবকিছু জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যেত। একটা ক্যামেরা অথবা মোবাইল ফোন মিউজিয়ামের ভেতরে আনতে পারলে ছবি তুলে নেওয়া যেত।

যাদুরাপ্পা মজা করে বলল, আমাদের দেশ হলে রজনীকান্ত ঠিক একটা ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারতেন। তবে এখানে তা সম্ভব নয়।

মিলস ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, রজনীকান্ত আবার কে?

ওসব তোমার বুঝে কাজ নেই। চলো, এখন আমাদের বেরোতে হবে। ওই দেখো সিকিউরিটি এসে গেছে। আঙুল দিয়ে ইউনিফর্ম পরা গার্ডের দিকে দেখিয়ে বলল যাদুরাপ্পা।

***

কায়রো শহরের মাঝখানে বেশ জনবহুল বাজারের মতন জায়গাটার পাশেই রয়েছে অনেকগুলো হোটেল। তার মধ্যে একটির নাম সোফিটেল। সেখানেই থাকছে যাদুরাপ্পা আর মিলস। ছিমছাম হোটেলটায় বেশিরভাগই দেশীয় লোকজন। তাদের মধ্যে যাদুরাপ্পা আর মিলস যেন ব্যতিক্রম। আজ সন্ধের পর হোটেলে ঢুকেই ওরা একটু আসরে বসেছে। স্কচ-হুইস্কি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায় কায়রো শহরে। মিলস আবার স্কচ ছাড়া খেতেই পারে না। গ্লাসে গ্লাস ঠুকে যাদুরাপ্পা বলল, মি. মিলস! এই কাজটা করার পেছনে আমার কিন্তু একটাই উদ্দেশ্য। আমার পূর্বপুরুষরা যে জিনিসের মালিক, আমি যেমন করে হোক তা ফেরত নেবই। তার জন্য

যতই ঝুঁকি নিতে হোক, আমি তা নিতে রাজি আছি। তোমাকে তো আমার পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে সবকিছুই বলেছি।

মিলস স্কচে অন্য কিছু মেশায় না। নিট স্কচটা একেবারে গলায় ঢেলে গ্লাসটা সামনে নামিয়ে রেখে সে বলল, হ্যাঁ। সেসবই আমি জানি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যে আরও অনেক বৃহৎ। সেটা তো তোমার অজানা নয়। আমি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চাই। আমার চাই সম্পদ এবং ক্ষমতা, দুটোই একসঙ্গে। তার জন্য যা করতে হয় আমি তা করব। তুমি তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো করেই জানো, যাদুরাপ্পা। কথাগুলো বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মিলস। তারপর আবার বলে উঠল, নাও, স্কচ ঢালো। আজ অনেকটা নেশা করব। এবার আরও কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কী যেন ভাবছিল মিলস। হঠাৎ করেই নীরবতা ভেঙে বলল, যে করেই হোক ওই প্যাপিরাসটা পাঠোদ্ধার করতেই হবে।

গ্লাসে স্কচ ঢালতে ঢালতে যাদুরাপ্পা বলল, না পারলেও কোনো সমস্যা নেই। আমরা মোটামুটি একটা ধারণা তো করতে পেরেছি। সেই ধারণার ওপর নির্ভর করেই আমরা এগোতে পারব। এটা আমার বিশ্বাস।

আর একটা নিট স্কচ গলায় ঢেলে মিলস জানতে চাইল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারটা তুমি জানলে কী করে বলো তো? সে তো বহু পুরোনো ইতিহাস। আমার তো মনে হয় না এর কোনো প্রামাণ্য নথি কোথাও রাখা আছে।

যাদুরাপ্পার কিছুটা নেশা হয়েছে। সে নেশার ঘোরেই এতদিনের না বলা সত্যিটা বলে ফেলল, আসলে ছোটোবেলা থেকেই আমার ইতিহাসের প্রতি ঝোক ছিল, ঠিক আমার বাবার মতন। আমাদের বাড়ির একটা বিশেষ জায়গায় বেশ কিছু প্রাচীন নথি রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির বয়স তো প্রায় কয়েক হাজার বছর। সেগুলো আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি, সরকারের হাতে এখনও পড়েনি। সেরকমই একটা নথি থেকে আমার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে আমার। আর আমি বিশ্বাস করি সেটা একশো শতাংশ সত্যি। মি. মিলস, তোমার সাহায্য ছাড়া হয়তো আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তোমার সঙ্গে যোগ দেওয়া। তবে শেষ মুহূর্তে যেন বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না।

মিলস বেশ জোরে জোরে হেসে বলল, যাদুরাপ্পা! নেশার ঘোরে কেউ মিথ্যে বলে না। আমিও তাই বলছি, তুমি আমার বন্ধু। আমরা দু'জন একসঙ্গেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাব।